International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 58-65
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.6.issue.05W.069

‘পথের পাঁচালী’ : মৃত্যু প্রসঙ্গ

মোঃ আজহারউদ্দিন
গবেষক

Abstract:

For a happy, smooth and safe life Men and Women fought against the nature, the wild from the day one of human civilization. Everyone wishes to exist, none wants to taste death; whether it is the human or the wild. But death is the certainity. Demise drugs the people from live to just a matter, exclusively the body remains. Within a second death turns people from known to unknown. So death is a great dilemma. With death all the organs stop to work and the body is either to be burned to ashes or to be buried, accordingly to their socialistic born.

What is death? What after death? A great curiosity persists. There are so many beliefs and analysis to Death. The common people believe that the cosmic earth rounds along with sin and deed, with hell-heaven. The good doers are rewarded heaven and the misdoers are cast to hell. On the other hand there lie some different aspects of Death in Indian Philosophy – the materialism and idealism. To materialism life ends to death. The Charvaka also believe so. According to Charvakism, the body amalgamates to soil and earth. On the contrary there is idealism. The Veda, The Upanishada to Vivekananda, Rabindranath, Aurobindo, and Jibanananda, none of them ignored the immortality of soul.

In the proposed article we shall open the course ‘Death’ in ‘Pather Panchalee’ by Bibhutibhushan Bandyopadhyay.

Keyword: Death, Death in Indian Philosophy (i.e. materialism, Idealism), Charvaka, Upanishda, Geeta, Death prescribed by the Indian Philosophers,(i.e-Rabindranath, Aurobindo, Swami Vivekananda) Michel Foucault, Bibhutibhushan Bandyopadhyay,’ Pather Panchalee’.

’Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has come’’

-Rabindranath Tagore

জীবন জন্ম-মৃত্যুর সীমা দিয়ে ঘেরা। জন্ম থেকেই জীবনের যাত্রা শুরু, মৃত্যুর প্রশান্তির মধ্যে তার সমাপ্তি। আসলে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। তাই তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘’বঙ্গভূমির প্রতি’’ কবিতায় অবলীলাক্রমে বলেছেন -

‘’জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে''[১]

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার সময়পর্বে চলে মানুষের বিবিধ কর্মযজ্ঞ। কবি, সাহিত্যিক কিংবা শিল্পী জীবনের কথা বলার জন্য উন্মুখ; মানব এবং মানব জীবন ছাড়া তো সাহিত্যের কল্পনা করা যায় না। এই সূত্র ধরেই সাহিত্যে চলে আসে জন্মের কথা, মৃত্যুর কথা।

মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ নানান প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে, হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করেছে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। তাদের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার লক্ষ্যই হল সুখ স্বচ্ছন্দে বাঁচা। মানুষ, জীবজন্তু সবারই বাঁচার আগ্রহ অদম্য; কেউই চায় না মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে বা মুখোমুখি হতে। অথচ মানুষ তথা জীবের জীবনে মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা তো নেই। মৃত্যু কর্ম চঞ্চল জীবিত মানুষকে এক লহমায় জড় পদার্থের ন্যায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়; পড়ে থাকে শুধু নিথর দেহখানি। মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে চেনাকে অচেনা, জানাকে অজানা করে তোলে। আপনজনেরা চিরকালের মত হারিয়ে ফেলে তাদের প্রিয়জনকে। তাই মৃত্যু জীবনের এক বিরাট প্রহেলিকা। মৃত্যুতে মানুষের বাহ্যিক দেহের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়; সমাজের নিয়ম অনুসারে তখন সে নিষ্ক্রিয় দেহকে দাহ অথবা সমাধিস্থ করা হয়।

এবারে প্রশ্ন হল মৃত্যু কী, মৃত্যুর পরে কী ঘটে? এসব রহস্যাচ্ছন্ন। এই মৃত্যু রহস্য ভেদের জন্য নানান লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। যেমন- সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাপ-পূর্ণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। ইহজগতে ভালো কাজের পুরস্কার স্বরূপ পরকালে আত্মার স্থান হয় স্বর্গে এবং খারাপ বা পাপ কর্মের জন্য আত্মার ঠাঁই হয় নরকে। এছাড়াও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মৃত্যু রহস্য ভেদ করার কথা ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে ওঠে; যথা- বস্তুবাদী দর্শন ও ভাববাদী দর্শন। বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি ; এর মধ্যে কোন আনন্দ নেই, মুক্তি নেই কেবল আত্মার ধ্বংস, নশ্বরতা। চার্বাকপন্থীরা এই মতবাদে বিশ্বাসী। এই দর্শনশাস্ত্র ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না; এমনকি কর্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদের প্রতিও কোন বিশ্বাস রাখে না। তাদের মতে মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। তাই তাদের কাছে আলাদা করে আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীতে প্রচলিত আছে ভাববাদী দর্শন। বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ আরো অনেকেই ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী; যার মূল কথা হল আত্মা অবিনশ্বর, কেবলমাত্র দেহের পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। মানুষের দেহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; পার্থিব জড়দেহ ও সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহ। বেদান্ত ভাষ্য অনুসারে- ''এই সূক্ষ্মদেহই আত্মার অন্তর আবরণ আর পার্থিব জড়দেহটা হল তার বাইরের আবরণ।''[২] ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের মতে 'সূক্ষ্ম বায়বীয়' দেহের কোন বিনাশ নেই, তা অবিনশ্বর; এপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য- ''এই যে জীবাত্মা এই যে মানবাত্মা ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, এই মানবাত্মা অজর, অমর, শাশ্বত ও সনাতন।''[৩] শ্রীমদ্ভাগবতগীতা-য় একই বাণী উচ্চারিত হয়েছে-

''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তন্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেশ পরন্তাপ।।''[৪]

(গীতা-৪/৫)

'হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম হয়েছে। সেগুলো তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি।'[৫] স্বামী অভেদানন্দ ''মরণের পারে'' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন- ''মৃত্যুর অর্থ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন চেতনার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তন। আর বিদেহী আত্মার এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় অবস্থান্তর। মৃত্যুতে জীবাত্মা জীর্ণবাসের মতো জীর্ণ জড়শরীর ত্যাগ করে।''[৬] আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন-

''...পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীর -বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরি-ব্যবধান-সম,...
...বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
আলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।'' [৭]

রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভাবনার সঙ্গে গীতার ২/২২ শ্লোকের ভাব সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। যথা-

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।''[৮]

(গীতা- ২/২২)

'মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ- আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।'[৯]

মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড়; মৃত্যু জীবনের নিশ্চিত এবং স্বাভাবিক পরিণতি। তাই মৃত্যুকে উদার ভাবে সাদরে গ্রহণ করতে পারলে তা আনন্দের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এবিষয়ে আলোকপাত করে বলেছেন- ''কি করে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু আনন্দের বা অমৃতের উপাদান হয়ে যায় তা বুঝতে হলে আমাদের আবার আনন্দের সংজ্ঞার উল্লেখ করতে হয়। দুই পক্ষ যখন খেলে তখন একপক্ষ হারে আর এক পক্ষ জেতে। সেখানে যে পক্ষ হারে তার ভাগ্যে দুঃখ, আর যে পক্ষ জেতে তার ভাগ্যে সুখ। যারা এই দুই পক্ষের সমর্থক তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটে। আর যদি কেউ নিরপেক্ষ দর্শক থাকেন, তাঁর ভাগ্যে সেই দুর্লভ বস্তুটি জোটে যাকে উপনিষদ বলে আনন্দ বা অমৃত। তার কারণ তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খেলার রস গ্রহণ করেন। এক দলের হার ও অপর দলের জিত তাঁর কাছে অর্থহীন; খেলা কতখানি জমে উঠল তাই তিনি দেখেন। অর্থাৎ তিনি খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিকে দেখেন না, অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন।''[১০] মৃত্যুতে অবশ্যই শোকবোধ আছে কিন্তু সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে উঠলে তখন শোকের দাহিকা শক্তি থাকে না; আমরা আনন্দ বা অমৃত লাভের যোগ্য হয়ে উঠি। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলে তা শোকানুভূতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদের ভাষ্য অনুসারে বিশ্বকে অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারলে তবেই অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়।

মৃত্যুর প্রসঙ্গকে সামনে রেখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক মতাদর্শ বুঝে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম থেকে পঁয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদে মোট তেরোটি মৃত্যু দৃশ্য বর্ণিত আছে। যথা -

বল্লালী বালাই

প্রথম পরিচ্ছেদ : রামচাঁদের পিতার মৃত্যু, রামচাঁদের শ্বশুর ব্রজ চক্রবর্তীর মৃত্যু, রামচাঁদের মৃত্যু, বিশ্বেশরীর মৃত্যু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঠ্যাঙাড়ে বীরুরায়ের মৃত্যু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গোলক, নিবারণ, রামচাঁদ চক্কোত্তির ভ্রাতবধূ প্রমুখের মৃত্যু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু।

আম আঁটির ভেপু

নবম পরিচ্ছেদ : ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রীর মৃত্যু।
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : তমরেজের মৃত্যু।
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : দুর্গার মৃত্যু।

অক্রূর সংবাদ

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : হরিহরের মৃত্যু।

একটি উপন্যাসে প্রধান অপ্রধান মিলে এতজন চরিত্রের মৃত্যু অবশ্যই গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে। যদিও অপ্রধান চরিত্রগুলির মৃত্যু উপন্যাসের কাহিনিতে তেমন কোন প্রভাব নজরে আসে না। তাহলে ঔপন্যাসিক কাহিনিতে এতজন চরিত্রের কেন অনুপ্রবেশ ঘটালেন আর কেনইবা তাদের মৃত্যুর প্রসঙ্গ এলো ? এর নেপথ্যে কি কোন বিশেষ কারণ আছে ? হয় নিশ্চয়ই আছে; কারণ যথাক্রমে 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিতা' গ্রন্থ দুটি পড়লে অবশ্যই নজরে আসে বালক অপু 'অপরাজিতা'-তে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে। বিভূতিভূষণ হয়তো উক্ত দুটি গ্রন্থে তিনটি প্রজন্মকে ধরতে চেয়েছেন। রামচাঁদ, রামচাঁদের পিতা ও শ্বশুর, ঠ্যাঙাড়ে বীরুরায়, ইন্দির ঠাকরুন প্রমুখরা প্রাচীন প্রজন্মের প্রতিনিধি; লেখকের ভাষায় সেকেলে সমাজের প্রতিনিধি। এরপর হরিহর, সর্বজয়া প্রমুখ অপুর পূর্ব প্রজন্ম এবং 'অপরাজিতা'-তে অপুর প্রজন্মের কথা বিধৃত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সূচনার দিকে সেকালের সংস্কৃতির ধারক-বাহক চরিত্রদের মৃত্যুর মধ্যে একটি প্রজন্মের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এত মৃত্যুর ভিড়ে যে তিনটি চরিত্রের মৃত্যু অনুরাগী পাঠককে ভাবিয়ে তোলে তাঁরা হলেন 'বল্লালী বালাই' অধ্যায়ের ইন্দির ঠাকরুন, 'আম আঁটির ভেঁপু' অধ্যায়ের দুর্গা ও সবশেষে 'অক্রূর সংবাদ' অধ্যায়ের হরিহর।

''পথের পাঁচালী'' উপন্যাসের প্রথম যে চরিত্রের মৃত্যু আমাদের মনে দাগ কাটে তিনি হলেন 'বল্লালী বালাই' অধ্যায়ের ইন্দির ঠাকরুন। ''পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না'' [১১] কিন্তু দুঃখের বিষয় এহেন অসহায় বৃদ্ধার শেষ কালটি কেটেছিল অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে। বিশেষত শেষ বয়সে সর্বজয়ার অকথ্য নির্যাতন ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে; অথচ একসময় সর্বজয়ার স্বামী হরিহরকে কোলে-পিঠে মানুষ করার মতো কঠিন দায় সামলেছিলেন। বয়সের ভারে জরাজীর্ণ এবং খাদ্যাভাব জনিত অপুষ্টিতে ভোগা বৃদ্ধার জীবনে নেমে এলো চরম পরিণতি; মৃত্যু ঘটলো পথের ধারে চরম অবহেলার মধ্যে। তাঁর এই মৃত্যু দৃশ্যে বর্ণনার মধ্যে কোন রব ছিলনা; না ছিল কোন সুদৃঢ় বিলাপ। সময় বয়ে যায়, সমাজের পরিবর্তন ঘটে, সঙ্গে জন্ম নেয় নতুন সংস্কার রীতিনীতি, অপমৃত্যু ঘটে সাবেকি ধারার। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুতে ঔপন্যাসিক উক্ত দিকটি ইঙ্গিত করে বলেছেন- ''ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।''[১২] এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'' উপন্যাসের বাঁশবনে ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে ডুবে থাকা বাঁশবাদি গ্রামের আদ্যিকালের কাহার বুড়ি সুচাঁদের কথা। যিনি দুলে দুলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শোনাতেন আর গভীর বেদনায় উচ্চারণ করতেন; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ উপকথার শেষ। ইন্দির ঠাকরুনের সঙ্গে কাহার বুড়ি সুচাঁদের এই জায়গায় ভারী মিল অনুভূত হয়।

'আম আঁটির ভেঁপু' অধ্যায়ের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্গা; উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন- ''দুর্গার বয়স দশ এগার বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা কাপড়, মাথায় চুল রুক্ষ . . . অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।''[১৩] 'পথের পাঁচালী'-তে দুর্গার ছয় থেকে ষোলো- এই দশ বছরের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তার মৃত্যুর সময় অপুর বয়স দশ বৎসর। অপু দুর্গার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার সঙ্গে থেকেই অপুর প্রথম প্রকৃতিকে দেখা ও চেনা। মেয়ের এই দুরন্তপনা সর্বজয়া পছন্দ করে না। দুর্গা সকালবেলা বেরিয়ে বাড়ি ফেরে সেই দুপুরে। পাড়ায় কোথায় কোন ঝোপে বৈচি পেকেছে, কোথায় কখন পাকা আতা, ঝুনো নারকেল পড়ে থাকে, কাদের কোন গাছে আম পাকে- সবই তার জানা। ঝড়ের সময় আম কুড়নোয় তার জুড়ি পাওয়া ভার। টমবয় দুর্গার এই স্বভাবের জন্য মায়ের কাছে বুকনিও খেতে

হয়েছে অনেক। একবার দুর্গাকে মারার সময় সর্বজয়া বলেছিলেন- ''বালাই আপদ চুকে যাক- একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।''[১৪] ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। সর্বজয়ার কথা-ই সত্য হল। অদ্ভুত কাকতালীয় ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরে দুর্গা চিরস্থান পেল ঐ ছাতিমতলাতেই। রেলগাড়ি দেখার ভারি সাধ ছিল দুর্গার। একবার ভাইকে নিয়ে রেলগাড়ি দেখতে গিয়ে বিপদেও পড়েছিল। রোগ শয্যায় অপুকে সেই সাধটির কথা জানায় সে- ''আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?''[১৫] প্রাণ-চপল এই বালিকার মৃত্যু প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বলেছেন- ''আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে- পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে- পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে- দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে !''[১৬] আকাশ এবং তার নীলিমা যেমন অনন্ত, অপরিবর্তনশীল ও চিরন্তন; এর যেমন সীমা নেই; তেমনি না আছে কোন ধ্বংস-সৃষ্টি; এক কথায় তা অবিনশ্বর। ঔপন্যাসিক এই ভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে মৃত্যুর ঘাট পেরিয়ে অমৃতের চিরন্তন তীর্থে ডাক আসার সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। এপ্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্যের 'কথা সাহিত্যের একলা পথিক : বিভূতিভূষণ' গ্রন্থের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল- ''মৃত্যুর করুণ রসে ভারাতুর করে তোলেনি আখ্যান; বরং মৃত্যুর যতি জীবনের গতিকেই অবারিত করে দিয়েছে বার বার।''[১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন মৃত্যুর অভয় রূপ ও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে লিখেছেন-

''আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণার আলো বাজে।''[১৮]

দুর্গার মৃত্যু সম্পর্কে বিভূতিভূষণ যে 'অনন্তের হাতছানি'-র কথা বলেছেন তা উপনিষদ কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শকেই সমর্থন করে।

উপন্যাসের একুশতম পরিচ্ছেদে ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে রানুর বিবাহের পর একটি সোনার সিঁদুরের কৌটা চুরির ঘটনা ঘটে, টুনির মায়ের সে কৌটা চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয় দুর্গাকে। যদিও সে অকথ্য নির্যাতনের মধ্যেও কোন অবস্থাতে চোরের অপবাদ স্বীকার করেনি। এর পরে একবছরে বহু ঘটনা ঘটে গেছে; তত দিনে দুর্গা অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছে। উপন্যাসের উনত্রিশতম পরিচ্ছেদে দেখি এক নির্জন দুপুরে অপু তাদের ঘরের মধ্যে রাখা কলশি থেকে আবিষ্কার করল সেই কৌটাটি। এর ইতিহাস তার কাছে অবিদিত ছিল না। অতএব সেটা তৎক্ষণাৎ বাঁশবনের গভীর জঙ্গলে ছুড়ে ফেলেছিল কাউকে কিছু না জানিয়ে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপে (সত্যজিৎ রায় পরিচালিত) এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে অপু সেটা পানাচ্ছাদিত পুকুরের জলে ঢিল দিয়ে ফেলে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থানের পানাগুলি একটু ফাঁকা হয় এবং কৌটাটি জলে ডুবে গেলে আবার যথারীতি পানা দিয়ে ঢেকে যায়। উপন্যাসের এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাববাদী দর্শন শাস্ত্র অনুসারে মৃত্যু মানুষের যাবতীয় পাপ, গ্লানি, দীনতা, মলিনতা সব মুছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

''. . . . . যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে, দিল ধৌত করি
ব্যাথার দ্রাবক রসে।''[১৯]

বিশ শতকের স্বনামধন্য মনস্বী দার্শনিক মিশেল ফুকো মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ''মৃত্যুকে তিনি জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী হিসেবে দেখেছেন যার শ্বেতশুভ্র উজ্জ্বলতা শরীরে কালো আবরণের আড়ালে রয়ে যায়। তাঁর মতে মৃত্যুই কেবল মানবজীবনের অভ্রান্ত অনন্যতাকে বৈধতা দিতে পারে। ১৯৬৩ সালের একটি বয়ানে ফুকো এই স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন : "It is in death that the individual becomes at one with himself, escaping from monotonous lives and their leveling effect ; in this slow, half subterranean, but already visible approach of death. The dull common life at last becomes an individuality; a black order isolates it, and gives it the style of its truth.'' [২০]

এখানে কাউকে কিছু না জানিয়ে দুর্গার সে চুরি করে আনা কৌটাটা ছুঁড়ে ফেলার মধ্যে সে দিককেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। শিশুমতি দুর্গার জীবদ্দশায় পাপ, গ্লানি যাই বলি না কেন; ঐ এতটুকুই। উক্ত ঘটনায় রূপকের অন্তরালে দেখানো হয়েছে অপুর হাত দিয়ে মৃত্যুই দুর্গার সে গ্লানি মুছে দিয়েছে। তাই দুর্গার নামের সঙ্গে আর চোর নামক কলঙ্কের হার সংযুক্ত হয়নি।

'পথের পাঁচালী'-র অন্তর্গত 'বল্লালী বালাই', 'আম আঁটির ভেঁপু', ও 'অক্রূর সংবাদ'- শীর্ষনামাঙ্কিত তিনটি অধ্যায়ের তিনটি বৃত্ত রচিত হয়েছে। তিনটি বৃত্তের কেন্দ্রে আছে তিনটি জীবন ও পরিণামে মৃত্যু। ইন্দির ঠাকরুনের জীবন বলয় নিয়ে 'বল্লালী বালাই'; 'আম আঁটির ভেঁপু' দুর্গার জীবন বলয় এবং হরিহরের কাশীবাসের জীবন নিয়ে 'অক্রূর সংবাদ।' এই বৃত্তগুলির মধ্য দিয়ে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে অপুর জীবন রেখা। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু এমনকি দুর্গার মৃত্যুতেও অপু কিন্তু মুক্ত জীবনের আনন্দের আস্বাদ পায়নি। তাই নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের সময় বারবার তার দিদির অন্তিম বাসনার কথা মনে পড়তে থাকে 'অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ?২১ তখনও পর্যন্ত বালক অপুর কাছে মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কোন বোধের-ই জন্ম হয়নি। তাই তার চেতনা পুরোপুরি পার্থিব জগতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। জীবন মরণ শুধু আবর্তন মাত্র। কোন কিছুই ধ্বংস হয় না, কেবল রূপান্তরিত হয়- এই বোধের জাগরণ ঘটলে তবেই মৃত্যুতে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়; ''জড়ের চেতনার পূর্ণতার ও প্রগতির প্রয়োজনবোধ উন্মেষের জন্য মৃত্যু এক অত্যাবশ্যক উপায় স্বরূপ।''২২ পিতা হরিহরের মৃত্যুতে 'জড়ের চেতনার পূর্ণতার ও প্রগতির' বোধ কিছুটা জাগরণ ঘটেছে। এই বোধের জাগরণ ঘটার ফলস্বরূপ পিতার মৃত্যুতে বার বার তার মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পুরাণের অংশবিশেষ-

''কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী . . .
লোকা সন্তু নিরাময়া . . . .''[২৩]

(মেঘ বর্ষিত হয়, পৃথিবী শস্যশালিনী হয় . . . ফলে মানুষেরা ভালো থাকে . . .)

পৃথিবীতে ষড়্ঋতু যেমন চক্রাকারে বার বার ঘুরে আসে নিত্য নতুন রূপে, তেমনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মার একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটে নিত্য নতুন ভাবে। আসলে জগত ও জীবনকে খন্ড ভাবে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সবই ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর; কিন্তু অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে জগত-জীবন-মৃত্যু সবই স্বাভাবিক, চিরন্তন; কোন কিছুর ধ্বংস হয় না, শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেমাত্র। পদার্থ বিজ্ঞানও আমাদের জানিয়েছে সবকিছুই শক্তির রূপভেদ মাত্র।

ধ্বংস না থাকলে সৃষ্টি হয় না; তেমনি সুখ-দুঃখও একে অপরের পরিপূরক। দুঃখের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়-

''আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে ।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ –
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।'' [২৪]

এ গানের ভাব বীজের সঙ্গে বিভূতিভূষণের ভাবাদর্শের অকৃত্রিম সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই যথার্থ শিল্পীর মতোই তাঁর উপন্যাসে দুঃখের আবহের মধ্যেই আনন্দের অবতারণা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনার ঠিক পরেই চলে এসেছে সরস্বতী পূজার প্রসঙ্গ; কিংবা দুর্গার মৃত্যুর পরেই বর্ণিত হয়েছে বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার অনুষঙ্গ।

বিভূতিভূষণ মৃত্যুকে দেখেছেন অভয় মূর্তিতে। তাঁর মৃত্যু ভাবনা জীবনানুরক্তির-ই আর একটি দিক। মৃত্যু তাঁর কাছে বিভীষিকা নয়; বরং তাঁর চিত্তের আনন্দ অনুভাবের একটা দিক। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা। তিনি ''হে অরণ্য কথা কও''- গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন- '' অনুভূতির প্রথম কথা হোল- মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো – অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোন কিছুরই না। 'ন মৃত্যু নশঙ্কা।' ভগবান যুগ যুগান্তর কল্প থেকে কল্পান্তর আমার ও তোমার হাত ধরে চলেছে, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে। সকল জন্ম মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেছেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। . . . জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি- আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলা সহচর, ভগবানও চিরদিন আমাদের লীলা সহচর।''[২৫]

'সকল জন্ম মরণ পার করে' অন্তহীন পথে চলার কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে বিভূতিভূষণের রচনায়; জীবন সম্পর্কে এটাই তাঁর ভাববাদী দর্শনজাত উপলব্ধি। যার প্রতিফলন আলোচ্য উপন্যাসের অন্তিম পরিচ্ছেদেও পরিস্ফুট হয়েছে- 'দিন রাত্রি পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায় . . . তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুঁড়োয় না . . . চলে . . .চলে . . . . এগিয়েই চলে . . . . অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ . . .''[২৬]

যা অনন্ত অথবা চিরন্তন তার কোন ধ্বংস নেই, সৃষ্টি নেই এক কথায় অবিনশ্বর; কেবল তার রূপান্তর ঘটে মাত্র। জীবন সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গি তাই ছিল। "তস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যু- মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃতও তাঁরই ছায়া";[২৭] 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মৃত্যু অনুষঙ্গে কথাটি একেবারে যথার্থ। তাই লেখক মৃত্যুর ছায়ার মধ্য দিয়ে অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবনেরই রসামৃত পরিবেশন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। Internet search, banglarkobita.com/poem/famous/395.
২। অভেদানন্দ, স্বামী; 'মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অভিমত' / 'মরণের পারে' / শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / ২য় সংস্করণ / পৃষ্ঠা- ৪০
৩। বিবেকানন্দ, স্বামী; 'আত্মা কি অমর' / 'মরণের পরে' / উদ্বোধন কার্যালয় / পৃষ্ঠা- ৬
৪। Internet search, https://vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-4-bengali.html
৫। Internet search, https://gitagaan.blogspot.com/2019/02/4th-chapter-gaanjog.html?m=?
৬। অভেদানন্দ, স্বামী; 'মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অভিমত' / 'মরণের পারে' / শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / ২য় সংস্করণ / পৃষ্ঠা- ৩৪
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'প্রান্তিক ' / বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯ / পৃষ্ঠা-৪
৮। অভেদানন্দ, স্বামী; 'মরণের পারে' / শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ / ২য় সংস্করণ / ভূমিকাংশ
৯। Internet search, https://bn.m.wikisource.org
১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় ; 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ ' / নবপত্র প্রকাশন / প্রকাশিত- ১৯৮০/ পৃষ্ঠা- ১৩৮
১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; 'পথের পাঁচালী' / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪২১ / পৃষ্ঠা-৪
১২। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৪

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৫
১৭। ভট্টাচার্য, সুতপা; 'কথা সাহিত্যের একলা পথিক : বিভূতিভূষণ' / পুস্তক বিপণি / পৃষ্ঠা-১০।
১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'পূজা'- ৩৪৮/ 'গীতবিতান'/ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ / প্রকাশিত - ১৯২৭ / পৃষ্ঠা- ১৪৪।
১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'প্রান্তিক'/ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ / পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯/পৃষ্ঠা-৩।
২০। ভট্টাচার্য, তপোধীর; ' মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব' / দে'জ পাবলিশিং / প্রথম সংস্করণ - ২০১৩ / পৃষ্ঠা - ২৪।
২১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; 'পথের পাঁচালী'/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪২১ / পৃষ্ঠা- ১৩৪।
২২। অরবিন্দ, শ্রী; 'মৃত্যু - শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমা' / 'কেন মৃত্যু' / শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি / পশ্চিমবঙ্গ / পৃষ্ঠা- ৪।
২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; 'পথের পাঁচালী' / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪২১ / পৃষ্ঠা- ১।
২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ' পূজা'- ২৪৮ / 'গীতবিতান' / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ / ১৯২৭ / পৃষ্ঠা- ১০৮।
২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; 'হে অরণ্য কথা কও' / আরতি এজেন্সি / পৃষ্ঠা- ১৩৩।
২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ; 'পথের পাঁচালী'/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স / ঊনত্রিংশ মুদ্রণ, ১৪২১ / পৃষ্ঠা- ২০৮।
২৭। আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন সংস্করণ) / প্রকাশিত - ৬ আগস্ট ২০১৬।